মনে পড়ে

বরণীয় মানুষ স্মরণীয় কথা

স্বামী বলভদ্রানন্দ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগদান করেছিলাম দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে। ধর্ম, আত্মা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—এসব বিষয়ে প্রথম আগ্রহ জুগিয়েছিলেন স্বামী মুমুক্ষানন্দজী; তিনি তখন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলেন। আমাদের কলেজেরই এক প্রাক্তন ছাত্র, আমার থেকে কয়েক বছরের বড়, সাধু হওয়ার কথা ভাবতেন। তিনি এইসময় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিলেন। সেটি একটি বিশেষ প্রেরণার কাজ করল। তারপর যখন কলেজের পড়াশোনা সদ্য শেষ হয়েছে, এক সহপাঠী এসে বললেন, ইনস্টিটিউট অব কালচারে প্রতি বুধবার স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী কথামৃত পাঠ করেন, দারুণ পাঠ হয়। তারপর থেকে আমার বন্ধু আর আমি নিয়মিতভাবে তাঁর কথামৃত পাঠ শুনতে বুধবার করে সেখানে ছুটে যেতাম। তখন সাধু হওয়ার কথা আমার মনে জেগেছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে নিতে আরও বছর খানেক কেটে গেল। এক বুধবার কথামৃত ক্লাসের আগে সাহস করে লোকেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে দেখা করলাম এবং বলেই ফেললাম কথাটা। তিনি শুনলেন আমার আবেদন, দু-একটা প্রশ্নও করলেন : পূর্বাশ্রমে কে কে আছেন, আমার ওপর পরিবার কতটা নির্ভরশীল, দীক্ষা হয়েছে কি না ইত্যাদি। দীক্ষা আগেই হয়ে গেছে জেনে খুশি হলেন। মিনিট দশেক কথা হল, তারপর বললেন, ''কবে আসতে চাও?'' আমি বললাম, ''কালই।'' ''কালই? বাড়িতে বলে-টলে আসবে তো?'' বললাম, ''না।'' তিনি একটু হাসলেন, তারপর বললেন, ''ঠিক আছে চলে এসো।''

পরের দিন বৃহস্পতিবার। চলে এলাম। স্বাভাবিকভাবেই পূর্বাশ্রমের লোকেরা প্রথম-প্রথম দু-একবার এসেছেন আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তাঁরা বিফল হয়ে ফিরে গেছেন, এই খবর পেলে মহারাজ রাত্রের ক্লাসে দেখা হলেই বলতেন, ''তাহলে ত—, প্রথম রাউন্ডে জিতে গেলে?'' ''দ্বিতীয় রাউন্ডেও জিতে গেলে!'' ইত্যাদি।

তিনদিন পরে সোমবার থেকেই পূজ্যপাদ মহারাজ আমাকে প্রকাশনা বিভাগে সহযোগিতা করতে বললেন। তখন ইংরেজিতে 'Cultural Heritage of India'-র পঞ্চম খণ্ড এবং বাংলায় 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের কাজ চলছে। এই বিভাগে তখন আমার উপরে আরও তিনজন ব্রহ্মচারী ছিলেন, আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়।

তাঁদের মধ্যে দুজন পরবর্তী কালে ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার সম্পাদক হয়েছেন। এঁদের কাছেই আমার প্রকাশনার কাজে হাতেখড়ি। এছাড়াও যাঁদের কাছে কাজ শেখার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা হলেন : নচিকেতা ভরদ্বাজ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, জ্যোতির্ময় বসু রায় প্রমুখ।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

এঁদের মধ্যে জ্যোতির্ময় বসু রায় সকলের কাছে হয়তো বিশেষ পরিচিত নন। কিন্তু অত্যন্ত গুণী মানুষ ছিলেন তিনি—ইংরেজি ও বাংলা উভয়ই খুব ভাল লিখতেন। বিচিত্র দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু অত্যন্ত ভক্ত মানুষ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপা পেয়েছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার চলচ্চিত্র সমালোচক ছিলেন। আর ভাল লাগছিল না বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে গোলপার্কের প্রকাশনা বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। শুনেছি, আনন্দবাজার তাঁকে ছাড়তে চাননি—পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে এক বছর তাঁকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন, যদি তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পালটায়। সেই সিদ্ধান্ত পালটায়নি এবং অবশ্যই তাতে আমাদের প্রকাশনা বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছে। ‘প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ’ বইটির সংকলন ও সম্পাদনা যে-দুজনের হাতে হয়েছে তাঁদের অন্যতম তিনি। তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অনুপুঙ্খ পাঠক ছিলেন। নিরহংকার সাদাসিধে নিপাট ভদ্রলোক ছিলেন, অকৃতদার। বন্ধুর মতো মিশতেন বলে তাঁর কাছে নিজের অজ্ঞতা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করে অনেক কিছু জেনে নিতে পারতাম। আরও একটি বিষয়ে আমার আর তাঁর আগ্রহ মিলিত হত, সেটি হল ক্রিকেট। আমাকে লেখা তাঁর একটি চিঠি কয়েক বছর আগে বইয়ের পাতার মধ্যে আবিষ্কার করি (তিনি বহুদিন হল প্রয়াত); তাতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু শেষে ‘পুনশ্চ’ দিয়ে লিখেছেন : ‘‘ক্রিকেট কেমন দেখছেন?’’ ‘শতরূপে সারদা’ গ্রন্থে ‘শ্রীমা : শ্রীরামকৃষ্ণের দশজন সন্ন্যাসি-শিষ্যের দৃষ্টিতে’ প্রবন্ধটি জ্যোতির্ময়বাবুর লেখা।

তাঁর কাছ থেকে বিজ্ঞানানন্দজী সম্পর্কে এই ঘটনাটি শুনেছিলাম। তাঁর দিদিও (বীণাপাণি বসু রায়) ছিলেন বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপাপ্রাপ্ত। ইন্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার আগে তাঁর দিদি গুরুর কাছে আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানানন্দজী আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ‘‘হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল হবে পরীক্ষা, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবি।’ কিন্তু রেজাল্টের গেজেট যখন বের হল, তখন দেখা গেল সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছেন। মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর—সেকেন্ড ডিভিশনের জন্য নয়, গুরুদেবের কথা কেন ফলল না এই ভেবে। পরে যখন মার্কশিট এল, তখন দেখলেন ফার্স্ট ডিভিশনেই পাশ করেছেন, গেজেটে ভুল ছিল।

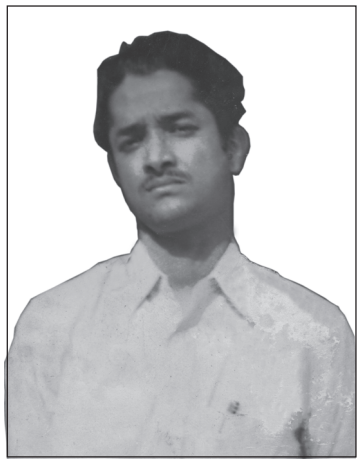

জ্যোতির্ময় বসু রায়
সৌজন্য : সোমনাথ বসু রায়

যতদিন ইনস্টিটিউট অব কালচারে ছিলাম, প্রকাশনা

বিভাগেই কাজ করেছি, তার সঙ্গে ধীরে ধীরে যুক্ত হয়েছে যুববিভাগ প্রভৃতি। আগেই বলেছি, লোকেশ্বরানন্দজীর কথামৃত ক্লাসের আকর্ষণে ছুটে যেতাম। সেইসময় মহারাজের ক্লাস এত জনপ্রিয় ছিল যে, বিবেকানন্দ হলের ১০০১টি সিট ভর্তি হওয়ার পরও বাইরের তিনটে বারান্দায় কার্পেট বিছিয়ে দিতে হত শ্রোতাদের বসবার জন্য। কখনও কখনও তাতেও হত না। শিবানন্দ হলে (তখন তার আসনসংখ্যা ছিল ২৫০) বসেও যাতে মহারাজের পাঠ শোনা যায়, তার জন্য বিশেষভাবে মাইক সংযোগের ব্যবস্থা করতে হত।

আমার যোগদানের আগে থেকেই শ্রোতারা মহারাজের কাছে আবেদন করছিলেন, মহারাজের বক্তৃতাগুলি রেকর্ড করে রেখে পরে বই হিসেবে যেন প্রকাশ করা হয়। আমি যোগ দেওয়ার পর প্রকাশনা বিভাগের একজন মহারাজের মনে হল, রোজ কাজের পরে আমি যদি মহারাজের মূল্যবান ক্লাসগুলি লংহ্যান্ডে লিখে নিতে পারি তো কেমন হয়? আমার দিক থেকে সাগ্রহ সম্মতি ছিল। অতএব মহারাজের কথামৃত ক্লাস রেকর্ডেড হতে শুরু করল এবং আমি সেগুলি লিখতে লাগলাম। মহারাজের সারা জীবন-ব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুধ্যান কত অনায়াসে আমার কানে, মনে এবং আশা করি অবচেতনেও ঢুকতে থাকল—ঠাকুরের অযাচিত কৃপায়। সারাদিনের সব কাজ ও জপধ্যানের ফাঁকে এই অনুলিখন কাজটি করতাম। রুমমেটের বিশ্রাম ও নিদ্রার ব্যাঘাত যাতে না হয়, সেইজন্য টেপ-রেকর্ডারে ইয়ার-ফোন লাগিয়ে মহারাজের বক্তৃতাগুলি এক লাইন করে শুনতাম আর লিখতাম। এক ঘণ্টার একটি বক্তৃতা ফুলস্কেপ কাগজে আমার হাতের লেখায় কুড়ি-পঁচিশ পাতায় দাঁড়াত। এক ব্রহ্মচারী দাদা আমায় ঠাট্টা করে বলতেন, ''মহারাজের প্রতিটি কথা তোর কান দিয়ে ঢুকে হাত দিয়ে বেরিয়ে গেল।''

আমি সন্ন্যাসের পূর্ব পর্যন্ত ন-বছর এই অনুলিখন করেছি। তারই ফলশ্রুতি 'তব কথামৃতম্' বইটি। এটি এখন আনন্দ পাবলিশার্স-এর প্রকাশনা। কিন্তু প্রথম-প্রথম বইটি 'তব কথামৃতম্' প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় এইরকম পর্যায়ক্রমে ষষ্ঠ পর্যায় পর্যন্ত ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকেই বের হয়েছিল। প্রথম দুটি পর্যায় সম্পাদনা করেছিলেন জ্যোতির্ময় বসু রায় এবং শেষ চারটি পর্যায়, প্রণবেশ চক্রবর্তী। ষষ্ঠ পর্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল মহারাজের মাত্র দশটি বক্তৃতা নিয়েই ছটি পুস্তিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কাজেই সম্পাদনার পদ্ধতি পালটাতে হল। মহারাজের দেড়শোটি বক্তৃতাকে অবলম্বন করে বিষয়-অনুযায়ী ভাগ করে এক খণ্ডের একটি বড় সংকলন প্রকাশ করবার কথা ভাবা হল। মহারাজ এটির সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকেই দিলেন। কিন্তু এগোব কোন পদ্ধতি ধরে? প্রথমেই আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ের জন্য কুড়িটি বিষয় চিহ্নিত করলাম। যেমন—শ্রীম ও কথামৃত, ভক্তিপথ, কলমীর দল, সংসারে থেকে সাধন, অবতারতত্ত্ব ইত্যাদি। এগুলি হবে প্রকাশিতব্য বইয়ের এক-একটি অধ্যায়ের শিরোনাম। এবার দেড়শোটি বক্তৃতায় ক্রমিক নম্বর বসিয়ে আমি-সহ চার জন তিরিশ-চল্লিশটি করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলাম। আমরা প্রত্যেকে এক-একটি বক্তৃতা পড়তে শুরু করলাম এবং তার মধ্য থেকে উপরিউক্ত বিষয়গুলি খুঁজে বার করে পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখতে লাগলাম।

এর ফলে শেষকালে এই ধরনের একটি তালিকা তৈরি হল প্রতিটি বিষয়ের জন্য : 'সংসারে থেকে সাধন' : ১।২০-২২, ২৩-২৫; ৫।১৫-১৬ ... ১৪৫।৫-৬, ৯-১০। অর্থাৎ মহারাজের ১নং, ৫নং, ও ১৪৫ নং বক্তৃতাগুলির ওই ওই পাতায় সংসারে থেকে কীভাবে সাধন করা যায়, সেই সম্পর্কিত আলোচনা আছে। আলোচনার ওই খণ্ড খণ্ড

অংশগুলিকে সংকলন ও সম্পাদনা করে দাঁড়াল প্রকাশিতব্য 'তব কথামৃতম্' বইয়ের 'সংসারে থেকে সাধন' অধ্যায়। পূজনীয় মহারাজ শেষ কপিটা দেখে অনুমোদন করে দিলেন। এইভাবেই 'তব কথামৃতম্' বইটি প্রস্তুত হল। আনন্দ পাবলিশার্স বইটি বার করলেন ১৯৮৬ সালে ঠাকুরের জন্মতিথির দিন। এখন এই এক খণ্ডের 'তব কথামৃতম্' বইটিই বাজারে পাওয়া যায়—ছ-পর্যায়ের পুস্তিকাগুলি পাওয়া যায় না। ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে এরপর মহারাজের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছে বইটির ইংরেজি সংস্করণ : 'Way to God: As Taught by Sri Ramakrishna.' যাঁরা অন্যদের জন্য কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের জন্য লোকেশ্বরানন্দজীর 'তব কথামৃতম্' এবং পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজীর 'কথামৃত-প্রসঙ্গ' বিশেষ সাহায্যকারী হতে পারে বলে আমার মনে হয়।

'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ'-এর প্রথম সংস্করণের সম্পাদনায় নচিকেতা ভরদ্বাজ ও স্বামী সোমেশ্বরানন্দ বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন। নচিকেতা ভরদ্বাজ ছিলেন কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের (National Library) বাংলা বিভাগের প্রধান। তিনি কবি—প্রধান কয়েকটি উপনিষদ কবিতায় অনুবাদ করেন। তিনি তেজসানন্দজীর ছাত্র (অর্থাৎ বেলুড় বিদ্যামন্দির কলেজের ছাত্র) ও স্বামী বিরজানন্দজীর দীক্ষিত ছিলেন। তাঁর লেখা ও বক্তৃতা খুব আক্রমণাত্মক ও চাঁছাছোলা ছিল। যেমন, একটি বক্তৃতায় তিনি শ্রীশ্রীমায়ের 'দোষ দেখো না' বাণীটি ব্যাখ্যা করছেন। হাতের তর্জনীটি শ্রোতাদের দিকে আর পরের তিনটি আঙুল নিজের দিকে মুড়ে বলছেন, ''এই দেখুন, আমি যদি আপনার দিকে একটি আঙুল তুলে বলি, তুই ব্যাটা বদমাশ, তাহলে তিনটে আঙুল আমার দিকে হয়ে যায়। তার মানে, আপনাকে খারাপ বললে, আমি আপনার চেয়ে থ্রি-টাইমস বেশি খারাপ।" এইরকম ছিল তাঁর বাচনভঙ্গি।

একবার কোনও এক রাজনৈতিক দলের যুববিভাগের কয়েকজন কর্মী তাঁকে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিল। দলটি ধর্ম-টর্ম একদমই মানে না। নচিকেতাবাবুর এঁদের সভায় যেতে ঘোরতর অনিচ্ছা। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা, বলতে থাকে, ''চলুন না, আমাদেরও তো আপনাদের মতোই ভাব।" অর্থাৎ বলতে চায় : আপনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার অনুসারী, সেই আদর্শ মানবসেবার কথা বলে, আমরাও মানবসেবার কথাই বলি। নচিকেতাবাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন : ''কী করে এক হল? আমাদের আদর্শ বলে, পরের দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। আর আপনাদের আদর্শ বলে, যত পার অন্যের দোষ দেখো, নিজের দোষ কখনও দেখবে না, স্বীকারও করবে না।"

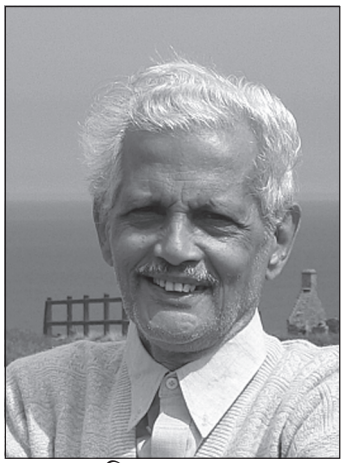

নচিকেতা ভরদ্বাজ
সৌজন্য : উদ্দালক ভরদ্বাজ

'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের নির্দেশিকা (index) প্রস্তুত করেছিলেন নচিকেতাবাবু। সেই লাইনো-টাইপ কম্পোজিং এবং প্রাক-ডিটিপি যুগে নির্দেশিকা-প্রস্তুতির ব্যাপারটি যথেষ্ট কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ছিল। বিশেষত বিষয়ভিত্তিক নির্দেশিকা (subject-index) তৈরি করা—ওই গ্রন্থে যা করা হয়েছিল। পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকলে কারও পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল

না। নচিকেতাবাবুর কাছে আমি এই বিদ্যাটি শিখেছিলাম, এবং পরবর্তী কালে 'শতরূপে সারদা'-র আংশিক এবং 'তব কথামৃতম্'-এর পূর্ণ নির্দেশিকা তৈরি করেছিলাম।

প্রথম দিকে কোনও সাধু-অতিথি এলে তাঁকে ইনস্টিটিউট অব কালচার ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব অনেক সময় আমার ওপর পড়ত। বয়স্ক সাধু এলে আমি সুযোগমতো তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম : ''মহারাজ, আপনি কি মাকে বা ঠাকুরের কোনও পার্ষদকে দেখেছেন? আপনি কার কাছে মন্ত্রকৃপা পেয়েছেন, মহারাজ?'' এইরকম একজন মহারাজ স্বামী ধৈর্যানন্দজীর কাছে যে-কাহিনি শুনেছিলাম, তা এখানে লিপিবদ্ধ করছি। মহারাজ বড় সাদাসিধে; সরলভাবে বললেন, ''আমার দীক্ষা পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে। কিন্তু অখণ্ডানন্দজীর কাছে দীক্ষা হতে পারত। আমি তাঁর কাছেই গিয়েছিলাম দীক্ষা নিতে। তিনিও রাজি ছিলেন। আমাকে শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'আগে কখনও দীক্ষা নাওনি তো?' আমি বললাম, 'না।' তারপর তিনি একটি আসনে বসলেন, আমাকেও তাঁর মুখোমুখি বসতে বলে চোখ বুজলেন। কিন্তু মুহূর্ত পরেই চোখ খুলে অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বললে কেন? তোমার তো ছোটবেলায় দীক্ষা হয়েছে।' তখন আমার মনে পড়ল, গ্রামদেশে ছোটবেলায় সমবয়সিদের সঙ্গে বাড়ির কাছে খেলাধূলা করছিলাম। একজন সাধু বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি আমাকে ডেকে আমার কানে একটা মন্ত্র দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা জপ করবি।' আমি বোধহয় দু-একদিন জপ করেছিলাম, তারপর সব ভুলে গেছি। মহারাজের ধমক খেয়ে সব ছবির মতো মনে পড়ে গেল। মহারাজ কিন্তু আর আমায় দীক্ষা দিলেন না। পরে বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়। এবার আর কোনও কিছু গোপন করিনি—সব কথা বলেছি; ছোটবেলার দীক্ষার কথা, অখণ্ডানন্দজীর রেগে যাওয়ার কথা—সব। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজী আমাকে কৃপা করলেন।''

স্বামী অখণ্ডানন্দ

আর একজন সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ছে। তাঁর সন্ন্যাসনাম আমার মনে নেই। তাঁকে সবাই বলতেন বাবাজী মহারাজ। তিনি মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত। প্রথম দিকে সঙ্ঘ যখন অতটা নিয়মবদ্ধ হয়ে ওঠেনি, তখন আমাদের বেশ কিছু সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে বা কোনও শাখাকেন্দ্রে এসে কিছুদিন থাকতেন, ঠাকুরের কাজ ও সাধন-ভজন করতেন, আবার বেরিয়ে যেতেন তপস্যায়। বাবাজী মহারাজ এইরকম ছিলেন—একসময় সঙ্ঘেই ছিলেন, কিন্তু আমি যখন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি আমাদের সঙ্ঘভুক্ত ছিলেন না, উত্তরাখণ্ডের কোথাও থাকতেন। কিন্তু সবাই তাঁকে খুব সম্মান করতেন, বিশেষত সেই সময়কার সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী। তিনিই তাঁর সবকিছুর তত্ত্বাবধান করতেন। বন্দনানন্দজী একদিন বেলুড় মঠ থেকে ফোন করে লোকেশ্বরানন্দজীকে বললেন, ''উনি আপনার ওখানে কয়েকদিন থাকতে পারেন কি?'' লোকেশ্বরানন্দজী বরাবরই অতিথিবৎসল, তিনি সানন্দে রাজি হলেন। বাবাজী মহারাজ তাই কয়েকদিন এসে আমাদের সঙ্গে রইলেন। আমি তাঁর টুকটাক সেবা করছিলাম আর সেই সূত্রে পুরনো দিনের কিছু কিছু কথা শোনবার সুযোগ

পাচ্ছিলাম। একদিন খোকা মহারাজের কথা বললেন। তাঁর সঙ্গে কীভাবে প্রথম সাক্ষাৎ হল, সেই কথা। মঠে যে-বাড়িতে স্বামীজী থাকতেন, সেই বাড়ির একতলার গঙ্গামুখী বারান্দায় একটি বেঞ্চ আমরা অনেকদিন দেখেছি। এখন সেটি মিউজিয়ামে আছে। এই বেঞ্চটি ঠাকুরের সব পার্ষদদের স্পর্শপূত। একদিন বাবাজী মহারাজ দেখেন সেখানে সরল সাদাসিধে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হাসিমুখে বসে আছেন। তাঁকে দেখেই হাত ধরে টেনে পাশে বসালেন, তারপর তাঁর একেবারে গা ঘেঁষে বসে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, নানা কথা নিজেও বলতে লাগলেন। এমন সময় বিশালকায় এক সন্ন্যাসী এসে হাজির। কটমট করে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, ''অ্যাঁ, তুমি জান না উনি কে? একেবারে গা ঘেঁষে এক আসনে বসে আছ? তোমার কোনও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? উনি পূজ্যপাদ খোকা মহারাজ। ঠাকুরের পার্ষদ।'' শুনেই বাবাজী মহারাজ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর খোকা মহারাজ তাঁর হাত ধরে টানছেন। কী করেন? সামনে ব্যাঘ্রসদৃশ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী আর পাশে মায়ের মতো ভালবাসা নিয়ে এক দেবপুরুষ! শেষে 'মায়ের'ই জয় হল—আবার বসে পড়লেন খোকা মহারাজের গা ঘেঁষে।

স্বামী শিবানন্দ

যেদিন বাবাজী মহারাজ বেলুড় মঠে ফিরে যাবেন, আমি বললাম, ''মহারাজ, আমি যদি আপনাকে চিঠি দিই আপনি উত্তর দেবেন তো?'' তিনি বললেন, ''না বাবা! আমি চিঠি লিখি না!'' তারপর বললেন কেন লেখেন না। মহাপুরুষ মহারাজ তখন স্থূলদেহে আছেন। বাবাজী মহারাজ থাকতেন বেলুড় মঠ থেকে দূরে কোনও কেন্দ্রে। কলকাতাতেই বেলুড় মঠের একজন ভক্ত ছিলেন, যিনি সাধুদের খুব সেবা করতেন। বাবাজী মহারাজ তখনও জয়রামবাটী-কামারপুকুর দেখেননি। দেখার খুব ইচ্ছে, কিন্তু হাতে পয়সা নেই। আশ্রমও এত গরিব যে নিজের তীর্থভ্রমণের জন্য পয়সা চাওয়া সম্ভব নয়। ভক্তটি সাধুদের খুব আপনজন হওয়ায়, অনেক ভেবেচিন্তে তাঁকেই সব খুলে লিখলেন। তাঁর দেওয়া অর্থে বাবাজী মহারাজের জয়রামবাটী-কামারপুকুর দর্শন সম্ভব হল। দুই জায়গায় কয়েকদিন কাটিয়ে তিনি বেলুড় মঠে এসেছেন। এদিকে ভক্তটিরও খুব তৃপ্তি হয়েছে যে, তিনি একটি অল্পবয়স্ক সাধুর জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দর্শনের আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করতে পেরেছেন। তিনি খুশি মনে মহাপুরুষ মহারাজকে সেই কথা জানিয়েছেন। বাবাজী মহারাজ বললেন, ''আমি মঠে গিয়ে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করা মাত্র তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'তুমি জয়রাবাটী-কামারপুকুর দর্শনের জন্য অমুকের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলে?' আমি অধোবদন। বুঝতেই পারলাম যে, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'কেন তুমি সাধু হয়ে অন্যের কাছে হাত পাতলে?' আমি ক্ষমা প্রার্থনা করলাম; বললাম যে, আর কখনও এই ভুল হবে না। তিনি বললেন, 'শোনো, এরপর কোনওদিন তুমি কারও কাছে কিছু চাইবে না। তোমার যা দরকার আমি দেব।' '' তারপর থেকে বাবাজী মহারাজ কোনওদিন কারও কাছে কিছু চাননি। চিঠির মাধ্যমে চেয়েছিলেন বলে, চিঠিই লেখেননি আর কোনওদিন। আমাকে বললেন, ''আমার কোনওদিন কোনওকিছুর জন্য অসুবিধে হয়নি। সব

মহাপুরুষ মহারাজজী জুটিয়ে দেন।”

আমি ইনস্টিটিউট অব কালচারে যোগদানের দু-বছর পর ১৯৭৮ সালে দক্ষিণবঙ্গে খুব বন্যা হয়। আমরা সাধু-ব্রহ্মচারী ও কর্মীরা বন্যাত্রাণের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছিলাম। অর্থের পরিমাণের দিক দিয়ে নয়, ভাবের দিক দিয়ে ব্যাপারটি ভাল ছিল। এরপরে কলকাতাই প্রবল বর্ষণে প্লাবিত হল। দক্ষিণ কলকাতার অনেক দরিদ্র মানুষ, যাঁরা নিচু এলাকায় থাকতেন, তাঁদের ঘরবাড়িতে জল ঢুকে গেল; তাঁরা সব নিকটবর্তী স্কুলবাড়িতে এসে উঠলেন। লোকেশ্বরানন্দজীর ইচ্ছা, এঁদের জন্য ত্রাণকাজ শুরু করেন। কিন্তু ইনস্টিটিউট অব কালচার একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—সেখান থেকে রিলিফ কখনও করা হয়নি, তাছাড়া ইনস্টিটিউটের নিয়মিত কাজেরও অনেক বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা। যে-সন্ন্যাসী সবচেয়ে করিৎকর্মা, প্রধানত যাঁকে সামনে রেখে লোকেশ্বরানন্দজী ওই রিলিফ কাজ শুরু করবেন ভাবছিলেন, তিনি ওইসব যুক্তি দেখাচ্ছিলেন। মহারাজ তাঁকে যে-কথাটি বলেছিলেন, সেটি আমার এখনও মনে আছে এবং আমি সেটিকে বিশেষ শিক্ষণীয় বলে মনে করি। মহারাজ বললেন, ‘‘শোনো, এগুলো সব হল কাজ না করার যুক্তি।” অর্থাৎ যে-কোনও কাজ করার সময় সত্যি সত্যিই কিছু সমস্যা থাকতে পারে। আমার কাজ করার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে ওই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আমার দুরকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। আমার যদি কাজটি করার ইচ্ছে না থাকে, তবে আমি ওই সমস্যাগুলি দেখিয়ে কাজটি থেকে বেরিয়ে আসব। আর যদি কাজটি করার আন্তরিক ইচ্ছে থাকে—তবে অবশ্যই আমি ওই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকব না। সেগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থেকে, সেগুলির বিষয়ে সাধ্যমতো ব্যবস্থা নিয়েই আমি কাজটি করতে এগিয়ে যাব।

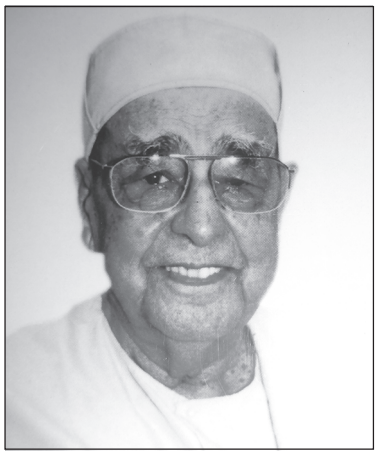

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

যাই হোক, শেষপর্যন্ত লোকেশ্বরানন্দজীর ইচ্ছাই বলবতী হয়। আমরা রিলিফ শুরু করি। কলকাতার জল কয়েকদিনের মধ্যেই নেমে গিয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে আবার নতুন করে বন্যা হওয়ায় প্রায় মাসখানেক কি তারও বেশি রিলিফ করেছিলেন লোকেশ্বরানন্দজী। মনে আছে, দুর্গাপূজা কেটেছিল ডোমজুড়ের কাছে রাজাপুর নামে একটি অঞ্চলের জলমগ্ন এলাকায়। সেবার বেলুড় মঠের দুর্গাপূজাও যথাসম্ভব অনাড়ম্বরভাবে করা হয়েছিল। প্রসাদের জন্য অন্যান্য বার যে-অর্থব্যয় হয়, তা যথাসম্ভব সীমিত রেখে হাওড়া জেলার বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে খাদ্যবিতরণের জন্য সেই অর্থ ব্যবহৃত হয়েছিল।

লোকেশ্বরানন্দজী কাজকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করতেন। মহারাজ যখন অন্য কোনও শাখাকেন্দ্রে যেতেন কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে যেতে ভালবাসতেন। আশ্রমে এক-দুজন সাধুকে মাত্র রেখে আমরা বেশ কয়েকবার গাড়ি ভর্তি করে জয়রামবাটী-কামারপুকুর গিয়েছি। যাওয়ার আগের দিন গড়িয়াহাট থেকে সর্বোত্তম মানের ফলমিষ্টি ও মাছ কিনে আনতেন; প্রচুর পরিমাণে। মাছগুলি আশ্রমে এনে সুন্দর করে টুকরো করে নেওয়া হত। তারপর সব সামগ্রী দু-ভাগ করে সুন্দর করে প্যাক করে

পরদিন খুব ভোরে রওনা হতাম, যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায় এবং মাছ রান্না করে ঠাকুর আর মাকে নিবেদন করা যায়। যতক্ষণ না সেগুলি ঠাকুর ও মায়ের কাছে পৌঁছনো হত, মহারাজ ততক্ষণ প্রাতরাশ করতেন না—যদিও অন্য সময় রাস্তায় কোনও জায়গায় মহারাজকে প্রাতরাশ দিলে গাড়িতে বসেই তিনি তা গ্রহণ করতেন। কামারপুকুরে পৌঁছে মহারাজ ও দু-একজন সাধু সেখানে নেমে যেতেন ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট সামগ্রী নিয়ে; আমরা কয়েকজন সোজা জয়রামবাটী চলে যেতাম মায়ের উদ্দেশে নির্দিষ্ট সামগ্রীগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

একবার এরকম দল বেঁধে বের হওয়ার কথা। আমার তখন বছরখানেক হয়েছে এই জীবনে। সবাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; আমারও কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেখলাম, প্রকাশনা বিভাগের কয়েকটি জরুরি কাজ এবং কথামৃত ক্লাসের অনুলিখন ওই কয়েকদিন না থাকলে আটকে যাবে। কী করি? যাওয়ার আগের দিন খুব দ্বিধা নিয়ে মহারাজের ঘরে গিয়েছি 'না যাওয়ার' অনুমতি নিতে। মনে ভয়, অল্পবয়স্ক বলেই হয়তো, মহারাজ যদি অসন্তুষ্ট হন! ঘরে ঢোকামাত্র মহারাজ বলছেন, ''কাল যাচ্ছ তো সবাই?'' আমি সসংকোচে শুধু এই কথা কটি বলেছি : ''মহারাজ, আমার না কয়েকটা কাজ...।'' বাক্যটা শেষ করতে পারিনি, মহারাজ ডান হাতের তর্জনীটি তুলে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন : ''খুব ভাল। ওয়ার্ক ফার্স্ট!'' আমার সব দ্বিধা-ভয় কেটে গেল, আনন্দে উৎসাহে বুক ভরে উঠল। মনে মনে এখনও মহারাজের সেই উদ্দীপ্ত মুখ দেখতে পাই : ''ওয়ার্ক ফার্স্ট!''

ড. নিমাইসাধন বসু (ঐতিহাসিক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার উপাচার্য), শঙ্করীপ্রসাদ বসু (পরিচয় নিষ্প্রয়োজন), ড. চন্দন রায়চৌধুরী (এশিয়াটিক সোসাইটির সেই সময়কার সেক্রেটারি) প্রমুখ শিক্ষাজগতের সেরা সব মানুষ লোকেশ্বরানন্দজীকে কী শ্রদ্ধা করতেন, স্বচক্ষে দেখেছি। শুধু শ্রদ্ধাই নয়, পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো ভালবাসতেন। মহারাজের কাছে এঁরা বালকের মতো হয়ে যেতেন। একবার দুর্গাপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় লোকেশ্বরানন্দজীকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের উদ্বোধন করতে। সময়টা ১৯৮৪। দুর্গাপুর হাউসে আমরা দু-রাত্রি ছিলাম। মহারাজের সঙ্গে সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ছিলাম পূর্ণাত্মানন্দজী, আমি এবং মহারাজের ব্রহ্মচারী সেবক। আর ছিলেন পূর্বোক্ত তিনজন (শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নিমাইসাধন বসু ও চন্দন রায়চৌধুরী) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যাত্রার সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল—মহারাজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীশচন্দ্র সান্যালের সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ। তিনি দুর্গাপুরেই থাকতেন। মহারাজ তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত। এই প্রধান শিক্ষকের প্রেরণাতেই লোকেশ্বরানন্দজী মহাপুরুষজীর কাছে গিয়েছিলেন। ইনিই তাঁকে সন্ন্যাসী হওয়ার প্রেরণা দিতেন। স্ত্রী অনুযোগ করতেন : ''পরের ছেলেকে সাধু হতে বলছ কেন, নিজের ছেলেকে বলতে পার না?'' শিক্ষক মহাশয় উত্তর দিতেন : ''ওরা সাধু হলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি জানি ওরা হবে না, তাই বলি না। এ হবে, তাই বলি।'' সেদিন শিক্ষক-ছাত্রের সাক্ষাৎকালে শিক্ষক-দম্পতির আনন্দ ও গর্ব যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি বরেণ্য সন্ন্যাসীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয় ও কৃতজ্ঞতা।

ফেরার পথের আর একটি ঘটনা স্মৃতির ফ্রেমে স্থায়ী হয়ে আছে। দুটি গাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম—মহারাজের গাড়িতে মহারাজের সঙ্গে আমরা তিনজন; পেছনের গাড়িতে নিমাইসাধন

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দন রায়চৌধুরী। আমাদের সঙ্গে আর একটি গাড়িতে কলকাতা আসছিলেন আনন্দগোপালবাবুও। পথে এক জায়গায় একটা লেভেল ক্রসিংয়ের কাছাকাছি রাস্তাটা একটু চড়াইয়ের মতো ছিল বলে আমাদের গাড়িটা আটকে গেল। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে একটু খুটখাট করে বলল, ''গাড়ি ঠেলতে হবে।'' শুনেই নিমাইসাধনবাবুরা সবাই গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এ বসল, আর ওঁরা চারজন হইহই করে মহারাজের গাড়ি ঠেলতে লাগলেন। আনন্দগোপালবাবুও ওঁদের সঙ্গে হাত লাগালেন। দুঃখের বিষয় তখন সেলফোন ছিল না, নাহলে এ-ছবি তুলে রাখার মতো—গাড়িতে বসে লোকেশ্বরানন্দজী, আর তাঁর গাড়ি যাঁরা ঠেলছেন, তাঁরাও এক-একজন দিক্‌পাল।

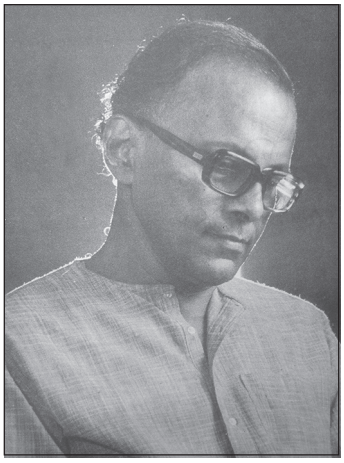

নিমাইসাধন বসু

নিমাইসাধন বসুর ভাষণ শোনবার মতো ছিল। বুদ্ধিদীপ্ত, গোছানো। চিন্তার বিষয় ও পারম্পর্যে একটুও অস্পষ্টতা না রেখে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সীমিত সময়েও আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করতে পারতেন। তবে 'প্যানেল ডিসকাশন'-এর মডারেটর হিসেবে তিনি অনবদ্য ছিলেন। স্বামীজী-বিষয়ক একটি আলোচনায় ইনস্টিটিউটের বিবেকানন্দ হলে তিনি মডারেটর ছিলেন। যতদূর মনে হয়, এটি ১৯৯২-৯৩ সালের কথা। পাঁচ-ছজন তরুণ-তরুণী আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই পড়াশোনা ও চিন্তাভাবনা করে নিজেদের বক্তব্য তৈরি করে এনেছিলেন। কিন্তু প্যানেল ডিসকাশন মানে তৈরি করা বক্তৃতা নয়। আমরা দেখলাম, নিমাইবাবু প্রথমেই আলোচক ছেলেমেয়েগুলির চিন্তা, জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে তাদের বক্তব্যগুলির তৈরি করা কাঠামোগুলিকে ভেঙে দিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে বের করে আনলেন তাঁদেরই প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা। কখনও আলোচনার খেই ধরিয়ে দিয়ে, কখনও তাঁদের অস্পষ্ট চিন্তাকে স্পষ্ট করে দিয়ে, কখনও বা স্পষ্ট বক্তব্যগুলিকে নিজের মন্তব্যের দ্বারা আরও বিস্তৃত করে দিয়ে তিনি আলোচনাচক্রটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক মাত্রায় নিয়ে গেলেন। শ্রোতার আসনে আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম ও দেখলাম— যাঁদের মধ্যে ছিলেন লোকেশ্বরানন্দজীও।

যুক্তি ও বুদ্ধির দীপ্তিতে, এবং মৌলিক চিন্তার অকৃপণ প্রকাশে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর বক্তৃতাও অত্যন্ত আকর্ষণীয় হত। কিন্তু দুজনের স্টাইলে প্রত্যাশিতভাবেই পার্থক্য ছিল। যে-সভায় এই দুজনই থাকতেন, শ্রোতাদের কাছে সেই সভা যেন আনন্দের ভোজসভা হয়ে উঠত। এঁরা দুজনেই হাওড়ার অধিবাসী, হাওড়ার ঐতিহ্যপূর্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত, আশ্রমের 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন'-এর এক সময়কার ছাত্র এবং ব্যক্তিগত জীবনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বলতে উঠে এঁরা দুজনেই একজন আর-একজনের পেছনে লাগবেনই। সুন্দর চিন্তা ও ভাষণ ছাড়াও তাঁদের দুজনের ওই মধুর, সংযত খুনসুটি শ্রোতাদের কাছে বড় উপভোগ্য হত।

নিমাইসাধন বসু ঐতিহাসিক ছিলেন, নিজের পড়াশোনার ক্ষেত্রে তিনি অনেক প্রবন্ধ ও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন, যেমন—'Indian Awakening and Bengal', 'Indian National

Movement : an outline', 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র', 'ভগ্ননীড় বিশ্বভারতী' প্রভৃতি। কিন্তু তিনি বোধহয় সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলেন 'সকলের মা মা সারদা' বইটি লিখে। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত এটিই তাঁর শেষ বই, মৃত্যুর পরে তাঁর লেখা আর কোনও বই বেরিয়েছিল কি না জানি না। বইটি প্রথমে 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হয়, তারপরে 'পুনশ্চ' সেটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। গ্রন্থটির প্রকাশ-অনুষ্ঠান হয় ইনস্টিটিউট অব কালচারের বিবেকানন্দ হলে। বেশ সুন্দর, বড় অনুষ্ঠান; হল ভর্তি হয়ে বাইরেও লোক দাঁড়িয়ে ছিল। বইটি প্রকাশিত হওয়াতে তিনি খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। দু-তিনদিন পরে তিনি আমাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন : তিনি ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন (বোধহয় বিশ্বভারতীতে)। একদল ছাত্রছাত্রী তাঁকে দেখে ঘিরে ধরে এবং উচ্ছ্বসিতভাবে তাঁর লেখা মায়ের বইটির প্রশংসা করতে থাকে। তিনি তখনও অভিভূত ছিলেন, তাঁর গলার স্বরে বুঝতে পারছিলাম। আমাকে বললেনও তাই : তাঁর লেখকজীবনে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এরকম স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি তিনি এর আগে পাননি। এর কয়েকদিন পরেই শুনলাম, তিনি হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন। সপ্তাহ দু-একের মধ্যে হসপিটালেই সেপটিসেমিয়া হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর আরও অনেক কিছু দেওয়ার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা অন্যরকম ছিল।

এবার শঙ্করীপ্রসাদবাবুর কথা আর একটু বলি। তাঁর চিন্তার জগৎ সর্বতোভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় ভরপুর ছিল। তাঁর কাছে দু-দণ্ড বসা মানেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা বিষয়ক কোনও না কোনও মৌলিক চিন্তা লাভ করা। নিজে 'সমকালীন ভারতবর্ষ' ও 'লোকমাতা নিবেদিতা'র মতো বহু খণ্ড গবেষণামূলক বই লিখেছেন। কিন্তু কতভাবে ছোট ছোট বই লিখে সাধারণের মধ্যে সহজে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার করা যায়, সে-সম্বন্ধেও তিনি গভীরভাবে ভাবতেন। তাঁর সঙ্গে এসব বিষয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে, কিন্তু লিখে রাখিনি। মানুষ এরকম ভুলই করে—গুণী মানুষ আর তাঁদের সান্নিধ্যের মূল্যবান সময়খণ্ডগুলো চিরকালই থাকবে ভেবে বসি। উভয়ই যখন আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়, তখন আফশোশ ছাড়া আর কিছু থাকে না। শুধু একটি খাতায় একদিনের আলোচনা লিখে রেখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যেমন আমরা স্বামীজীর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার সংকলন করে 'সবার স্বামীজী'র মতো বই করেছি, তেমনি স্বামীজীর ভাবনা-জগতের বিভিন্ন দিক নিয়েও ছোট ছোট সংকলন-পুস্তিকা হতে পারে; সেগুলির মাধ্যমে জনসাধারণকে সহজে স্বামীজীর চিন্তার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোকিত করা যেতে পারে। যেমন—জ্ঞানী বিবেকানন্দ (স্বামীজীর জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে উক্তির সংকলন), ভক্ত বিবেকানন্দ (স্বামীজীর ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উক্তির সংকলন), কর্মী বিবেকানন্দ (স্বামীজীর কর্মযোগ সম্বন্ধে উক্তির সংকলন), সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ (সন্ন্যাস সম্বন্ধে উক্তি সংকলন), স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ (ভারতবর্ষ-সম্পর্কীয় উক্তির সংকলন), মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ (মানবপ্রেম সম্বন্ধীয় উক্তির সংকলন), কবি ও সাহিত্যিক বিবেকানন্দ (সাহিত্য সম্বন্ধে উক্তির সংকলন), সংগীতশিল্পী বিবেকানন্দ (সংগীত সম্পর্কীয় উক্তির সংকলন)। এইরকম অনেক চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরত, তিনি সেগুলি সুযোগ পেলেই প্রকাশ করতেন, যাতে অন্যেরা কেউ সেই চিন্তা অনুযায়ী ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাজে তাঁরই মতো অধ্যবসায় নিয়ে অগ্রসর হয়। স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি দিনভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ছিল। তিনি ভেবেছিলেন একটু অবসর পেলেই ওই

কাজটি নিয়ে বসবেন; তার জন্য প্রস্তুতও হচ্ছিলেন অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু কাজটি শুরু করার সময় পেলেন না।

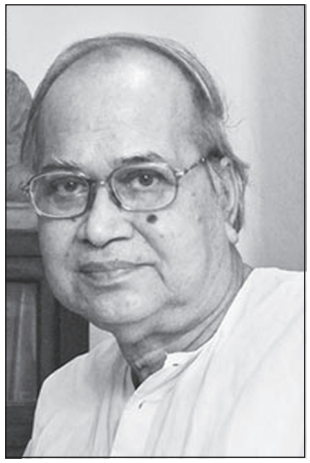
শঙ্করীপ্রসাদ বসু

চা খেতে ভালবাসতেন শঙ্করীবাবু, তবে যেমন-তেমন চা বা যেমন-তেমনভাবে তৈরি চা নয়। আমি সাধু হওয়ার আগে জানতাম না যে, চা-পান বিষয়টি এত গভীর। ব্রহ্মচারী হওয়ার পর লোকেশ্বরানন্দজীকে মাঝে মাঝে চা করে খাওয়াতাম, তখনই ধীরে ধীরে চা-এর মহিমা আমার কাছে প্রকাশিত হল। চা-প্রস্তুতি গুরুমুখী বিদ্যা। মহারাজকে যে-কর্মী ছেলেটি চা করে খাওয়াত তার কাছ থেকে আমাকে অভিনিবেশ সহকারে এটি শিখতে হয়েছে। প্রথমে টী-পটটিকে কলের গরম জলের ধারায় বাহ্য ও অভ্যন্তরে উষ্ণ হয়ে কয়েকটি উচ্চমানের চা-পাতাকে নিজ কক্ষে ধারণের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তারপরে ভিন্ন একটি পাত্রে প্রস্তুত ন-অতি-উষ্ণ জল ওই টী-পটে ঢালতে হবে। দু-তিন মিনিট পরে টী-পটের অধিকাংশ চা-পাতা তাদের সেরাটি দিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে পাত্রের নীচে বীরশয্যা গ্রহণ করবে। তখন কোনও ছাঁকনি ব্যবহার না করে দুধ-চিনি ছাড়া সেই চা পেয়ালায় ঢালতে হবে সেবনের জন্য। দু-একটি চা-পাতা টী-পট থেকে চলে এসে পেয়ালায় ভাসবে, কিন্তু তাতে কোনও বিঘ্ন হবে না, চা-পানের আমেজ তাতে বাড়বে। মহারাজকে চা করে খাওয়াতে খাওয়াতে আমারও এইরকম চা-ই প্রিয় হয়ে উঠেছিল, এবং এখনও তা-ই আছে।

এইরকম চা-এর সন্ধানেই শঙ্করীবাবু বিকেলবেলা আমার কাছে আসতেন। একদিন 'বুলেটিন' ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা প্রায় সবাই চলে গেছে। একসঙ্গে চা-পানের পর শঙ্করীবাবুও বিদায় নিলেন। ডিপার্টমেন্টের লম্বা করিডোর দিয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে যখন চলে যাচ্ছেন, তাঁর অপসৃয়মাণ দীর্ঘ দেহটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এই জানা-সত্যটাই মনে উঠে এল; যে-কর্মীটি আমাদের চা দিয়েছিল তাকে বলেই ফেললাম কথাটা : ''জান নিতাই, পাঁচশো বছর পরে তোমাকেও কেউ মনে রাখবে না, আমাকেও না। কিন্তু ওই যে মানুষটি চলে যাচ্ছেন, যাঁকে তুমি এক্ষুনি চা খাওয়ালে, তাঁকে কিন্তু লোকে মনে রাখবে।" চিরকালীনকে ছুঁয়ে থেকে সত্যিই শঙ্করীপ্রসাদ বসু সমকালকে অতিক্রম করে গেছেন।

'শতরূপে সারদা' গ্রন্থটির প্রকাশের সময় শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। আমরা তখন একটা দল বা টিম হিসেবে মায়ের বইটির কাজ করতাম। পূর্ণাত্মানন্দজী তখন প্রকাশনা বিভাগের প্রধান, আমি তাঁর সহকারী। আমার পাশের ঘরে বসতেন আমাদেরই এক সহকর্মী প্রদ্যুৎ গাঙ্গুলি। অকৃতদার, সাধুসদৃশ জীবন। প্রতিদিন আমরা এই তিনজন পাণ্ডুলিপিগুলি নিয়ে বসতাম। প্রদ্যুৎবাবু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য গভীরভাবে পড়েছেন, 'নিবোধত' পত্রিকাতেও কখনও কখনও লিখেছেন। প্রধানত তিনিই মায়ের সম্বন্ধে পুরনো উদ্বোধন বা অন্যত্র কোথায় কী তথ্য পাওয়া যায় ঘেঁটে ঘেঁটে বের করতেন। যে-লেখার পক্ষে যেটি উপযুক্ত, সেটি একসঙ্গে বসে আলোচনা করে যোগ করতাম এবং পরিমার্জন বা সংশোধন করতে করতে এগোতাম। শঙ্করীপ্রসাদ বসু সপ্তাহে একদিন আসতেন। আমাদের দেখে দেওয়া প্রবন্ধগুলি তাঁর জন্য রেখে দিতাম। তিনি এসে সেগুলি পড়তেন, প্রয়োজনমতো একটু-আধটু সম্পাদনা করতেন বা

কোনও কিছু সাজেস্ট করতেন। তিনি একবার না দেখে দিলে আমরা সাধারণত এগোতাম না। লোকেশ্বরানন্দজীকেও সবসময় কাজের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত করে রাখা হত এবং অধিকাংশ প্রবন্ধই তিনিও একবার দেখতেন ও প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করতেন। সম্পাদিত প্রতিটি প্রবন্ধই আমরা শেষে লেখক বা লেখিকার কাছে পাঠাতাম অনুমোদনের জন্য।

'শতরূপে সারদা'র কাজ চলার সময়েই শঙ্করীবাবু একদিন জিজ্ঞাসা করলেন : ''বলুন তো! মায়ের সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা মায়ের জীবিতকালে কে বলেছে?'' আমি সঙ্গে সঙ্গে গড়গড়িয়ে বলে দিলাম : ''কেন, স্বামীজী! ওই যে মহাপুরুষ মহারাজকে লেখা চিঠি—রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান ক্ষতি নেই, মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! মা-কে কেন্দ্র করে গার্গী-মৈত্রেয়ী সব জন্মাবে! মা আশীর্বাদ করলেন, আর হুপ করে পগার পার! স্বামীজী ছাড়া আর কে?'' উনি বললেন, ''না! সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ কথা মায়ের সম্বন্ধে বলেছেন নিবেদিতা।'' এরপরে তুলে ধরতে থাকলেন তাঁর এই চিন্তার স্বপক্ষে যুক্তি। সেদিন যেসব কথা তিনি বলেছিলেন, তারই আরও গভীর আরও বিস্তৃত প্রকাশ 'শতরূপে সারদা'র সেই অনবদ্য প্রবন্ধটি—'নিবেদিতার ধ্রুবমন্দির'। নিবেদিতার সম্বন্ধে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আন্তরিক অন্তরঙ্গ মূল্যায়ন, যা তিনি আমার কাছে একদিন প্রকাশ করেছিলেন, তা হল এই : ''এক-এক দিক দিয়ে বড় নারীচরিত্র আমাদের দেশে এসেছে। কিন্তু বহুদিক একসঙ্গে একই জীবনে এইভাবে সমন্বিত হয়ে আর কোনও নারী এর আগে আসেননি।'' একটি মুগ্ধ মুহূর্তে স্বগতোক্তির মতো করেই তিনি এই কথাটি বলেছিলেন। তিনি এটিকে নিয়ে আর বিস্তার করেননি। আমারও এই নিয়ে আরও আলোচনা করা পরে হয়ে ওঠেনি। তবে আমার মনে হয়, শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতেই নিবেদিতাকে তিনি এই স্থান দিয়েছেন এবং অবতার-সঙ্গিনী ভাগবতী ব্যক্তিত্বদের তিনি এই বিচারের বাইরে রেখেছেন।

স্বামী মাধবানন্দ

স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষের সময় শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর হাওড়ার বাড়িতে অসুস্থ হয়ে শয্যাবন্দি ছিলেন। এই 'বন্দিদশা' তাঁর আর কাটেনি। আমি আর বিমলাত্মানন্দজী একদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁকে আনন্দ করে বলেছিলাম, দেশ-বিদেশ জুড়ে কীভাবে সবাই স্বামীজীকে স্মরণ করছে, গ্রহণ করছে, অন্যেও যাতে গ্রহণ করে তার জন্য সার্থক চেষ্টা করছে। তিনিও শুয়ে শুয়ে আনন্দিত হয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর আস্তে আস্তে হাসিমুখে আমায় বললেন, ''আর-একজনের কথা তো বললেন না?'' আমি বললাম, ''কার কথা?'' ''ঠাকুরের কথা?'' অর্থাৎ বলতে চাইলেন, স্বামীজীকে নিয়ে জগদ্‌ব্যাপী এই যে-লীলা, তা-ও তো ঠাকুরেরই লীলা। আমার অনুমান হল, তাঁর ভেতরটা এখন স্বামীজীর জায়গায় রামকৃষ্ণময় হয়ে গেছে। জীবনভোর বিবেকানন্দে নিমগ্ন থাকার সেই তো অমোঘ ফলশ্রুতি!

লোকেশ্বরানন্দজীর কথা আবার একটু বলি, কারণ তাঁর কাছে আমার জীবনের বাইশটি বছর কেটেছে। দীক্ষাগুরু মহাপুরুষ মহারাজের পরই তাঁর

জীবনে যে-সন্ন্যাসীর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বলে তিনি নিজেই মনে করতেন, তিনি হলেন স্বামী মাধবানন্দজী—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নবম অধ্যক্ষ। মাধবানন্দজীর দেহত্যাগের পর তিনি 'Vedanta Kesari'তে তাঁর সম্বন্ধে যে-নিবন্ধটি লিখেছিলেন তার শিরোনামটি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ : 'The Passing of a Gentleman' (Aug 1967)—একজন ভদ্রলোক চলে গেলেন। মাধবানন্দজীর জীবন অজস্র গুণে মণ্ডিত—স্বয়ং শ্রীশ্রীমা তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।'' কিন্তু ভদ্রতার যে-স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যটি লোকেশ্বরানন্দজী মাধবানন্দজীর মধ্যে দেখেছেন, সেটি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বেরও স্পষ্ট লক্ষণ ছিল। পূজ্যপাদ আত্মস্থানন্দজী তাঁর সম্বন্ধে বলতেন, ''কানাইদা সত্যিই ভদ্রলোক।'' 'কানাই' লোকেশ্বরানন্দজীর পূর্বজন্মের নাম। ভদ্রতা, মধুর ব্যবহার ও হৃদয়বত্তার জন্য লোকেশ্বরানন্দজীকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু প্রয়োজনে তিনিই অত্যন্ত দৃঢ় হতে পারতেন। তিনি নরেন্দ্রপুরে ও ইনস্টিটিউট অব কালচারে দুটি সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক বিক্ষোভের মোকাবিলা করেছেন যথাক্রমে ষাটের দশকের শেষে ও সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। উভয়ক্ষেত্রেই বিক্ষোভ চলেছিল মাসের পর মাস ধরে। দু-ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল তাঁর সাহসী অনমনীয় মনোভাবের জন্যই। কিন্তু দৃঢ় হলেও রূঢ় কখনও হতেন না। তিনি নিজেই বলেছেন, প্রয়োজনে যখন তাঁকে কারও কারও সঙ্গে শক্ত ব্যবহার করতে হয়েছে, তখন তিনি রাতে ঘুমোতে পারেননি, যদিও যার প্রতি শক্ত হয়েছেন তাকে হয়তো বলেননি সেকথা; কারণ তাতে শক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিনি বলতেন, ''মানুষকে কথা দিয়ে যা আঘাত করা যায়, মারলেও অতটা আঘাত করা হয় না।''

আর-একটি কথা তিনি আমায় বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে : ''দেখো, আমি আমিই।'' অর্থাৎ আমি আমার নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্যেই স্থির থাকব—অবশ্য সদ্‌গুণের ক্ষেত্রেই কেবল এই অনড় অবস্থান। অন্যের ব্যবহার যদি আমার প্রতি অন্যায্য হয়, তার জন্য আমার ব্যবহারটাকে আমি কখনই অন্যায্য হতে দেব না। আর পরিস্থিতি যতই provocative হত, ততই তিনি শান্ত হয়ে যেতেন। একজন বিখ্যাত অধ্যাপিকা কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে এলে মহারাজ তাঁকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথার মধ্যে এই কথাটি বলেছিলেন, "The moment you lose your temper, know that you are losing your ground." এটি আমি মহারাজের প্রয়াণের পরে ওই অধ্যাপিকার মুখে শুনেছি। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও পড়াশোনা ও জপধ্যানে তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল। প্রতিদিন দুবার কি তিনবার তিনি জপধ্যানে বসতেন। দুটি ক্যারটিড আর্টারি-ই নব্বই শতাংশেরও বেশি ব্লক্‌ড্ থাকায়, ডাক্তারের নির্দেশে শেষ কবছর তিনি বসে জপ করতে পারতেন না, শুয়ে শুয়ে করতে হত। তিনি বলতেন, ''সবসময় মনে মনে জপ করা যায়; এমনকী কথা বলতে বলতেও জপ করা যায়।'' এ থেকে মনে হয় তিনি নিজে বোধহয় তা-ই করতেন।

ঘরে বসে সবসময়ই তিনি পড়তেন বা লিখতেন। আর তারই মধ্যে অজস্র ফোন হাসিমুখে রিসিভ করতেন, একটুও বিরক্ত না হয়ে। বহু ভক্ত বোধহয় তাঁকে ফোন না করে দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো শুরুই করতেন না। তাই প্রতিদিন সকাল সাতটা নাগাদ আমরা সাধু-ব্রহ্মচারীরা যখন তাঁকে প্রণাম করতে যেতাম, তখন দেখতাম তাঁর ঘরের তিনটে ফোনই পরপর বেজে উঠছে। ভক্তদের ফোনগুলি অনেকসময় আমরাই ধরে তাঁদের অপেক্ষা করতে বলতাম, তিনি আর একটি ফোনে কথা বলছেন বলে। তিনি একে একে সবার সঙ্গে কথা বলতেন। মধুর স্বরে বলতেন, ''ভাল আছ

তো বেশ? ভাল থেকো।" এক-দেড় মিনিটের বেশি কারও সঙ্গেই কথা বলতেন না, কিন্তু এত ভক্তের 'এক-দেড় মিনিট'গুলি তো তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার পরিসরকেই একটু একটু করে অধিকার করত—তিনি কিন্তু সেটি হতে দিতেন প্রসন্ন মনে। একদিন ফোনের ওপাশের ভক্তটি নিশ্চয় প্রশ্ন করেছেন, ''মহারাজ, কেমন আছেন?" কারণ মহারাজ এপাশ থেকে উত্তর দিচ্ছেন—যেটি আমরা শুনতে পাচ্ছি—''আমি কোনওদিনই ভাল থাকি না। আমার বোধহয় এত লোকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত হয়নি। আমাকে প্রতিদিনই কারও না কারও দুঃখের কথা শুনতে হয়, তাই কোনওদিনই আমি ভাল থাকি না।" এই 'empathy' বা সমানুভূতির জন্যই নিজের শত অসুবিধা সত্ত্বেও কখনও তিনি কাউকে উপেক্ষা করতে পারতেন না।

লোকেশ্বরানন্দজী ক্রিকেট খেলা দেখতে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু খেলা দেখতে দেখতেও তিনি উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ করছেন, এ আমরা দেখেছি। বল হল, ব্যাটসম্যান স্ট্রোক নিলেন, তিনি দেখলেন এবং উপভোগ করলেন, আবার চোখ নামিয়ে এক-দু লাইন অনুবাদ করে নিলেন—পরবর্তী বল হওয়ার আগেই। আর এ যে ভান নয়, তাঁর অনূদিত উপনিষদের বইগুলিই তার প্রমাণ। জীবনের শেষ কয়েকবছর তিনি উপনিষদেরই অনুধ্যান করতেন সবসময়, বলতেন, ''আমি স্বপ্নেও উপনিষদ দেখি।" শোয়ার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন বলে আমাদের কাছে এ-সংবাদ ছিল না—কিন্তু আমারই এক সমবয়স্ক সন্ন্যাসী বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন, ''আমি যদি রাত বারোটার সময়ও আশ্রমে ফিরি, আর সারাদিন কিছু পড়ার সুযোগ না পাই, তাহলে একটু পড়ে নিয়ে তবে শুতে যাই।"

তিনি আমাকে দেহত্যাগের মাত্র দিন-পনেরো আগে তাঁর এক স্বপ্নদর্শনের কথা বলেছিলেন, ''আমার অনেক দিনের সাধ, যদি মায়ের কাছ থেকে একটা মন্ত্র পেতাম! তা যখন নরেন্দ্রপুরে, একদিন স্বপ্নে দেখি, স্বামীজীর ঘরের ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে মাকে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে আনছি। (আমি এখানে প্রশ্ন করেছিলাম, 'কেন আপনি মাকে ওইভাবে আনছেন?' মহারাজ বললেন, 'স্বপ্নে সেটা স্পষ্ট নয়; হয়তো মা অসুস্থ, কিংবা মা আমার খুব আদরের...') সেইসময় মায়ের মুখটা তো আমার বাঁ কানের কাছে, মা আমাকে ওই অবস্থাতেই একটা মন্ত্র দিলেন। আমি মহাপুরুষ মহারাজের দেওয়া মন্ত্র জপ করি, আবার মায়ের দেওয়া মন্ত্রও জপ করি।"

সেদিন ওই কথার ধারাতেই তিনি আরও কিছু কথা বলেছিলেন। মাত্র কয়েকদিন আগে ভোরবেলা ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে গিয়ে তিনি মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। ইনস্টিটিউট অব কালচারে তিনি যে-ঘরে থাকতেন, তার পাশেই আশ্রমের ঠাকুরঘর। ওই দর্শনের সূত্রেই তিনি নিম্নলিখিত দর্শনের কথাও বললেন, ''কয়েকবছর আগে, তখন হরিপদ বেঁচে আছে (স্বামী প্রেমরূপানন্দ, লোকেশ্বরানন্দজীর খুড়তুতো ভাই, জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের এক সময়ের অধ্যক্ষ), মঙ্গলারতির পর মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করছি, হঠাৎ দেখি মা সামনে! ভাবছি, মা-কেই দেখছি কি? হ্যাঁ, মা-ই তো! তাকিয়ে আছি! কিছুক্ষণ পরে মনে হল, একজন মহিলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি, এ তো ঠিক নয়! চোখটা যেই একটু নামিয়েছি, দেখি কেউ নেই। মহামায়া তো! মায়া চেলে দিলেন! সামনে থেকে তখন হরিপদ আসছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কোনও মহিলাকে ওদিকে যেতে দেখলে?' হরিপদ বলল, 'না তো!' আহা! মায়ের কী উজ্জ্বল চোখ! যেন কাচের মতো। আমার এমন দুর্ভাগ্য যে, মাকে একটু প্রণাম করলাম না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''স্বামীজীকে কখনও দেখেছেন?"

মহারাজ বললেন, ''না।'' তারপরেই বোধহয় রাজা মহারাজের ভাবনা তাঁর মন দখল করল। এক নাগাড়ে বলেই যেতে লাগলেন : ''মহারাজকে আমার খুব ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে...।'' এবং চোখে-মুখেও ভাল লাগার ভাবটা ফুটে উঠল।

সেদিন বা তার পরেও কোনওদিন মহারাজকে আমার জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি যে, মহারাজ রাজা মহারাজের দর্শন কখনও পেয়েছেন কি না, কারণ মাত্র দিন-পনেরো পরই ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তিনি দেহত্যাগ করেন। সুসান ওয়ালটার্স বলে এক মহিলা ভক্ত, আমেরিকার নাগরিক, বুলেটিন ও ইংরেজি বই-এর কাজে সাহায্য করার জন্য দীর্ঘদিন ইনস্টিটিউট অব কালচারে ছিলেন। মহারাজের সঙ্গে তাঁর যা কথোপকথন হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, তিনি তার অনেকটা নোট করে রেখেছিলেন। মহারাজের দেহত্যাগের পর তাতে দেখেছিলাম, আশ্রমের প্রশাসনিক কাজে কোনও সমস্যা হলে, লোকেশ্বরানন্দজী বেলুড় মঠে এসে রাজা মহারাজকে সব জানাতেন। লোকেশ্বরানন্দজী মনে করতেন, রাজা মহারাজ তাঁর প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান করে দেন।

আর দুটি ঘটনা বলে লোকেশ্বরানন্দজীর প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রথমটি মহারাজের সেবক-সন্ন্যাসীর মুখে শোনা। সে তখন ব্রহ্মচারী। মহারাজ সকাল ১০-১১টা নাগাদ যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা শেষ করে ইনস্টিটিউট অব কালচারে ফিরছেন। দেরি হয়ে গেছে বলে তিনি তাড়া অনুভব করছেন অফিসে ফেরার জন্য। এমন সময় দেখলেন, একটি ছেলে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে উশখুশ করছে। তখন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, ছেলেটিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে পরীক্ষার্থী। মহারাজ নিজের গাড়িটা ছেলেটির সামনে থামাতে বললেন, জিজ্ঞেস করলেন, ''পরীক্ষা আছে? বাস পাচ্ছ না? আমার গাড়িতে উঠে এসো।'' ছেলেটিকে তার পরীক্ষাকেন্দ্রে নামিয়ে দিয়ে তবে তিনি আশ্রমে ফিরলেন।

অপর ঘটনাটি শুনেছি, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর প্রয়াত অধ্যাপিকা ড. দীপ্তি পালের কাছে। তিনি বিরজানন্দজী মহারাজের শিষ্যা ছিলেন এবং বিজ্ঞানী হলেও শাস্ত্রপ্রীতি ছিল। প্রতি শুক্রবার লোকেশ্বরানন্দজী ইংরেজিতে উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন বিবেকানন্দ হলে। ৭-১৫ পর্যন্ত ক্লাস চলত। তারপর অফিসে এসে মহারাজ একটু চা খেতেন। যাঁদের উপনিষদ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন থাকত, তাঁরা কয়েকজন সেইসময় মহারাজের অফিসে যেতেন। মহারাজের তখন অন্য কথা ভাল লাগত না। অন্য কোনও কথা তিনি বা অন্যেরা সাধারণত বলতেন না। মিনিট ১৫-২০ পর মহারাজ ঘরে যেতেন, হাত-মুখ ধুয়ে জপে বসে পড়তেন।

মহারাজের কাছে এক মাঝবয়সি বিধবা মহিলা আসতেন, যাঁর মাথাটা একটু খারাপ। মহারাজ তাঁকে স্নেহ করতেন, কিন্তু অনেকেই তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হত। একদিন উপনিষদ ক্লাসের পর যথারীতি মহারাজ তাঁর অফিসে বসে চা খাচ্ছেন। ড. দীপ্তি পাল উপস্থিত আছেন, অন্যরাও আছেন, উপনিষদ বিষয়েই কথা হচ্ছে। এমন সময় সেই মহিলাটি সেখানে ঢুকে পড়েন এবং মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সেই অবস্থাতেই পড়ে থাকেন। দীর্ঘক্ষণ হলেও ওঠেন না। মহারাজ প্রথমে খেয়ালই করেননি যে মহিলা পায়ের কাছে পড়েই আছেন। হঠাৎ চোখ পড়ায় মহারাজ অত্যন্ত রেগে যান এবং খুব ধমক দিয়ে তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেন। পরিবেশই এতে অন্যরকম হয়ে যায়, মহারাজ ঘরে যাওয়ার জন্য উঠে পড়েন, অন্যরাও চলে যান। পরদিন সকালবেলা দীপ্তি পাল মহারাজকে ফোন করলে মহারাজ নিজেই গতদিনের প্রসঙ্গটি তুলে বলেন, ''দেখো, কালকের ঘটনায় আমি খুব বিরক্ত

হয়েছি।" দীপ্তি পাল বলেন, ''হ্যাঁ মহারাজ, মহিলাটির আচরণ সত্যিই বিরক্তিকর।" মহারাজ বলেন, ''না, আমি ওর ওপর বিরক্ত হইনি, নিজের ওপর বিরক্ত হয়েছি। ও তো পাগল, ও ওরকম করতেই পারে; কিন্তু আমি কেন এত রূঢ় হলাম!"

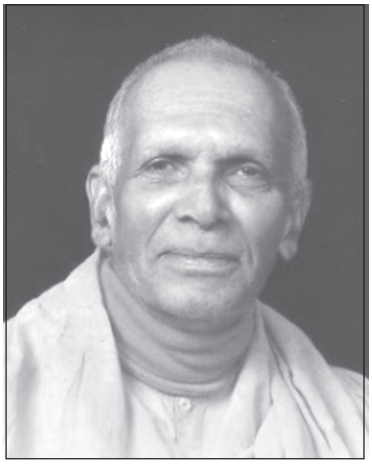
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূজ্যপাদ রঙ্গনাথানন্দজীর কথা একটুও না বললে মনে হবে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে গেল। স্বামীজীর ভাবের সাম্প্রতিক বিগ্রহ তিনি। দেশকে কতটা ভালবাসতেন তিনি এবং নাগরিক কর্তব্যবোধে কতটা নিষ্ঠ ছিলেন—তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই ঘটনাটি। শুনেছি তাঁর সচিব-সেবক স্বামী অসীমাত্মানন্দের কাছে। দিল্লির রাস্তায় গাড়ি করে যেতে যেতে মহারাজ দেখলেন, সামনের গাড়ি থেকে এক দম্পতি কলা খেয়ে কলার খোসা রাস্তায় ফেলে দিল। মহারাজ তৎক্ষণাৎ নিজের ড্রাইভারকে বললেন, ''গাড়ি থামাও, খোসাটা তোলো।" তারপর বললেন, ''ওই গাড়িটিকে follow করো।" ড্রাইভার তাই করল। মহারাজ নিজের গাড়িটিকে ওই গাড়ির পাশে নিয়ে গিয়ে তাদের গাড়িটিকে থামাতে বললেন। তারপর জানালার কাচ নামিয়ে কলার খোসাটি তুলে ধরে ওই দম্পতিকে বললেন, ''তোমাদের পরিবারে কতজন সদস্য?" তাঁরা হয়তো বললেন, চার বা পাঁচ। মহারাজ বললেন, ''পারবে তোমরা তোমাদের ঘরের মেঝেতে এই কলার খোসাটি ফেলতে?" তাঁরা মাথা নেড়ে বললেন : ''না।" মহারাজ : ''তোমাদের পরিবারে মাত্র চার-পাঁচ জন সদস্য, তাদের কথা ভেবে ঘরের মেঝেতে এই খোসাটা ফেলতে পার না, আর এই রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার লোক সবসময় যাচ্ছে, তাদের অসুবিধার কথা তোমাদের মনে এল না?"

দেহত্যাগের কিছুদন আগে হাসপাতাল থেকে ভারতবর্ষের প্রতিটি এম. পি.-র কাছে (মোট ৫৪৫) স্বামীজীর একটি বই এবং তাঁর নিজের একটি বই মহারাজ পাঠিয়েছিলেন—এই বিশ্বাসে যে, বই দুটি নিশ্চয়ই তাঁদের প্রকৃত দেশসেবক হওয়ার প্রেরণা দেবে।

আমার এক অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী-বন্ধুর কাছে পূজ্যপাদ রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের অহংশূন্যতার একটি কাহিনি শুনেছি। মায়ের জন্মতিথি। পূজ্যপাদ মহারাজ মাত্র মাস তিনেক আগে সঙ্ঘাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বেলুড় মঠে এসেছেন। বন্ধুটি সচিব-সেবককে বলে মহারাজের সঙ্গে একাকী তাঁর ঘরে দেখা করেছেন এবং দু-একটি কথার পর মহারাজকে বলেছেন, ''আপনি যদি আপনার হাতটি আমার মাথায় রেখে আশীর্বাদ করেন, আমি তাহলে ধন্য বোধ করব।" পূজ্যপাদ মহারাজ বলেন, "What is there in placing my hand on your head? You can also place your hand on my head. There is nothing special in my hand." বন্ধুটি বলে, ''মহারাজের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল, ধরণী দ্বিধা হও।" পরে অবশ্য মহারাজ তাঁকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন।

সঙ্ঘের এক সময়ের সহাধ্যক্ষ, রাজা মহারাজের একনিষ্ঠ প্রিয় সেবক, পূজ্যপাদ নির্বাণানন্দজী মহারাজের কথা বলে শেষ করব। একবার কোনও বিশেষ তিথিতে আমরা কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী

মঠে এসেছি। লোকেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে এসেছি বলে অসময়েও নির্বাণানন্দজীর ঘরে ঢুকে পড়েছি প্রণাম করার জন্য। প্রণামের পর লোকেশ্বরানন্দজী পূজ্যপাদ মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে খুব বিনীতভাবে হাতজোড় করে দু-একটি কথা বলছেন, আর নির্বাণানন্দজী মৃদু মৃদু হাসছেন। তিনি ফতুয়া পরে চেয়ারের দুটি হাতলে হাত দুটি রেখে বসেছিলেন। হঠাৎ হাত দুটি চিৎ করে একটি বিশেষ ভঙ্গি করে বললেন, ''এখন একমাত্র চিন্তা, যাদের ভার নিয়েছি তাদের উদ্ধার করতে পারব কি না।'' খুব সুন্দর স্বরে, আশ্বস্ত করার সুরে লোকেশ্বরানন্দজী বললেন, ''নিশ্চয়ই পারবেন মহারাজ, নিশ্চয়ই পারবেন। আপনি তো সেই বাহাদুরি কাঠ!'' একটু থেমে মহারাজ বললেন, ''আমারও মনে হয়, পারব।''

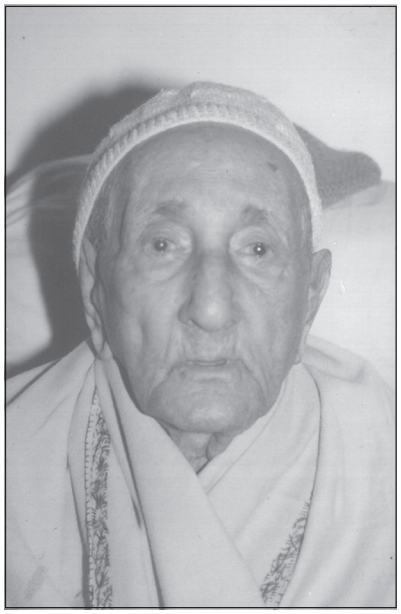

স্বামী নির্বাণানন্দ

আর একবার গুরুপূর্ণিমার দিন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে বেলুড় মঠে যাচ্ছি। তখন নির্বাণানন্দজী রুটিন চেকআপের জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানে আছেন। লোকেশ্বরানন্দজী বললেন, ''মঠে তো ওঁকে পাব না; ফেরার সময় সেবাপ্রতিষ্ঠানে নেমে ওঁকে প্রণাম করে যাব।'' এদিকে মঠে পৌঁছে শুনলাম, আগের দিন বিকেলে মহারাজ ফিরে এসেছেন। অন্য সব জায়গায় প্রণাম শেষ করে আমরা মহারাজের ঘরে এলাম। লোকেশ্বরানন্দজী পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করে বললেন, ''মহারাজ, কী ভাগ্য আমাদের! ভেবেছিলাম আপনাকে মঠে পাব না, কিন্তু আপনি ফিরে এসেছেন।'' সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ বললেন, ''আসতাম নাকি! ঠাকুর এসে বললেন : এই, মঠে চল, কাল কত লোক আসবে! তাই চলে এলাম।'' মহারাজের সচিব-সেবক জ্ঞান মহারাজের কাছেও শুনলাম, মহারাজ সত্যিই বিকেলবেলা বলতে থাকেন : ''ঠাকুর এসেছিলেন, মঠে যেতে বলেছেন, আমি মঠে যাব!''

নির্বাণানন্দজীর জীবনভোর গুরুসেবায় তুষ্ট হয়ে রাজা মহারাজ মহাপ্রয়াণের সময় তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, ''তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে।'' মহাপুরুষ মহারাজও তাঁর একটি কাজে খুশি হয়ে বলেছিলেন, ''মহারাজ তোমাকে বলেছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান হবে। আমিও তোমাকে বলছি, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হবে, আলবৎ হবে।'' শেষ বয়সে তিনি নিজের মুখে বলতেন যে, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। সেবকরা তাঁর সঙ্গে তাঁদের এই বিষয়ক একটি কথোপকথন রেকর্ড করে রাখেন। তাঁর দেহত্যাগের পর আমরা সেটি শুনেছি। সেবক প্রশ্ন করছেন : ''রাজা মহারাজ আপনাকে যে-আশীর্বাদ করেছেন, তা কি আপনার হয়েছে?'' মহারাজ উত্তর দিচ্ছেন : ''হ্যাঁ''।

''কোনও সন্দেহ নেই?''

''না।''

''একটুও না?''

''একটুও না, এখন আমি শিওর ব্রহ্মজ্ঞানী।'' 'শিওর' কথাটি মহারাজ খুব জোর দিয়ে বলছেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ একবার আমার সামনেই বলেছিলেন, ''লোকে আমাদের কাছে আসতে পারে কৃপালাভের জন্য। কিন্তু সাধন-ভজন না করলে হবে না।''